*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 52
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 440 - 450
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

**Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)**
**A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture**
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 440 - 450
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

# স্বাধীনোত্তর ভারতের আদিবাসী সমাজ : সমস্যা, নীতি ও সম্ভাবনা

ড. পার্থ মন্ডল
গবেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: mpartha745@gmail.com
0000-0002-0994-3860

***Received Date*** *28. 09. 2025*
***Selection Date*** *15. 10. 2025*

***Keyword***
*Tribal issue, Post-independence India, Five-Year Plans, Nehru's Panchsheel for Tribals, Indian Constitution, Policy formulation, Loss of tribal identity, Subsistence Economy, Colonial isolation, Mainstream assimilation.*

***Abstract***
*In post-independence India, the issues related to the development of the tribes have been evolved into one of the country's most complex and multifaceted challenges. At its core lay the dilemma of integrating tribal communities into the national mainstream while preserving their distinct identity and cultural heritage. During the colonial period, the deliberate isolation of tribal groups was largely driven by political motives. In contrast, independent India, through its Constitution and various Five-Year Plans, envisioned economic and political upliftment for the tribal population. To address tribal concerns, several practical measures were undertaken, such as the implementation of land rights, agricultural development, amendments to forest conservation laws, provision of healthcare, industrialization in tribal areas, and improvement of transportation infrastructure. However, the effectiveness and outcomes of these efforts remain subjects of deep analysis and debate. Another key issue was the tendency of post-independence policy makers to club Dalits and tribals under a single category for policy formulation. However, it is essential to recognize that tribals and Dalits are fundamentally different in many respects — socially, historically, and culturally. Understanding the place of tribal communities in post-independence India requires a careful examination of the contemporaneous debates that shaped such policies. Globally, the lifestyle and cultural identity of indigenous peoples have been subjects of significant disagreement and discourse. In India too, two major ideological perspectives emerged regarding the role and integration of tribal communities within the broader society. One perspective advocated for granting tribals the right to live independently, with autonomous control over their traditional territories, free from external interference. The opposing view emphasized rapid assimilation of tribal communities into the broader socio-economic fabric of Indian society - even if it meant the erosion or eventual disappearance of tribal ways of life. According to this view, such assimilation should be welcomed as a sign of 'progress'. Jawaharlal Nehru, however, took a more nuanced stance. Through his policy of 'Panchsheel', he opposed forced*

*assimilation and instead encouraged the organic growth of tribal communities in accordance with their innate creative capacities. His vision was to ensure tribal development in a democratic and culturally sensitive manner, enabling them to rise from backwardness without compromising their identity and traditions. This article presents a comprehensive review of these issues and perspectives, shedding light on the evolving approaches to tribal integration and development in post-independence India.*

## Discussion

ভারতীয় আদিবাসীরা নতুন সাংবিধানিক সংস্করণ ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ফলাফল হিসাবে যা অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল তা কোনো ভিন্ন বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। এটাকে অবশ্যই আদিবাসী আইন প্রণালীর সঙ্গে জড়িত মতবিরোধ ও তার সম্ভাব্য পরিণতির সঙ্গে যুক্ত করা উচিত। বস্তুত আদিবাসী সম্পর্কিত মতবিরোধের সূত্রপাত ঘটে ঔপনিবেশিক সময়কাল থেকেই। একদিকে ঔপনিবেশিক সরকার ভারতীয় আদিবাসীদের 'ট্রাইব' নাম দিয়ে যেমন অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে পৃথক করার চেষ্টা করে, তেমনি অন্যদিকে ব্রিটিশ আইন-নীতি আদিবাসীদের রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করেছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসী রীতিনীতির মূলস্রোত থেকে আদিবাসীদের বিরত রাখা। আর এই জন্য ব্রিটিশ সরকার আদিবাসীদের জন্য ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে বহির্ভূত অঞ্চল (Excluded Area) সৃষ্টি করে। তবে এর চার বছর আগে অর্থাৎ ১৯৩১ সালে জে.এইচ. হাটন (J.H. Hutton) ছিলেন এই স্বতন্ত্রকরণ নীতির প্রবর্তক। তিনি এক সুরক্ষিত ও বিশেষ অঞ্চল চেয়েছিলেন, যেখানে আদিবাসীদের বিশেষ করে তাদের আদর্শ ও সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করা যায়। ১৯৩১ সালের সেনসাস রিপোর্টে তিনি এই বিষয়ে উল্লেখ করেন যে, -

> "The solution of problem would appear to be to create Self-Governing tribal areas with free power of self-determination in regard to surrounding or adjacent provincial units."[১]

অন্যদিকে ভেরিয়ার এলুইন যিনি একজন বিখ্যাত জনজাতি পর্যবেক্ষক ও নৃতত্ত্ববিদ তিনিও একই মত প্রকাশ করেন। মধ্যপ্রদেশে দীর্ঘ সময় ধরে তিনি জনজাতিদের জন্য বহু জনহিতকর কাজ করেছিলেন এবং গোণ্ড জনজাতির এক মহিলাকে বিয়েও করেন। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ দশ বছর তিনি গোণ্ড সমাজে বসবাস করে তাদের জীবনচর্চা ও সমাজধারাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তবে শুধু গোণ্ড সমাজ নয়, সামগ্রিকভাবে ভারতীয় আদিবাসী সমাজকে নিয়েই গবেষণা করেছিলেন। ভারতের আদিবাসীদের সম্পর্কে তিনি কতকগুলি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেন :*The Tribal world of Verrier Elwin*, *A Philosophy for NEFA*, *The Aboriginals*, *Issues in Tribal Policy Making*, *For The Tribal way*, *The Tribal People of India*, *A New Deal for Tribal India, The Baiga* প্রভৃতি, আর এই গ্রন্থগুলি ভারতীয় আদিবাসী বিষয়ক অনবদ্য রচনা। ড. এলুইন তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, সভ্যতার সংস্পর্শ (Culture-Contact) আদিবাসী জীবনধারাকে বিনষ্ট করেছে। এ সম্পর্কে তিনি তাঁর *The Aboriginals* গ্রন্থের উনিশ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, যেসব আদিবাসীরা সভ্যতার দূষিত সংস্পর্শে আসেনি তারা নিরীহ ও সুখী মানুষ এবং তারা স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ জীবন-যাপনের মাধ্যমে সারা বছর উৎসবে ও নৃত্যে মাতোয়ারা। সেই সঙ্গে আদিবাসী ছেলে-মেয়েরা অলংকারে সুসজ্জিত হয়ে চুলে ফুল গুঁজে দল বেঁধে নাচে আর প্রবীণেরা দেবতার তুষ্টি বিধান করে। অন্যদিকে যেসব আদিবাসীরা সভ্যতার সংস্পর্শে লালিত তাদের জীবন সম্বন্ধে এসেছে একটা উদাসীনতা, দেখা দিয়েছে আত্মমর্যাদাবোধের অভাব। অন্য সংস্কৃতির মধ্যে বেড়ে ওঠা আদিবাসীদের এই মনোবলকে তিনি 'স্নায়বিক হানি' (Loss of Nerve) বলে অভিহিত করেছেন। উন্নত বিজাতীয় সংস্কৃতির সংঘাতে পড়ে গোষ্ঠীগত সংস্কৃতি ক্ষুণ্ণ হওয়ায় তাদের জীবন যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তার ফলেই মনের এই শোচনীয় রূপান্তর ঘটেছে, যার প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে তাদের স্বতন্ত্র সমাজ-সংস্কৃতিতে। আদিবাসীদের নিয়ে তাঁর নৃতাত্ত্বিক গবেষণাকে তিনি 'Philanthropology' বলে উল্লেখ করেছেন।[২] আদিবাসী বিষয়ক তাঁর এই গবেষণা পরবর্তীতে নেহেরুর আদিবাসী ভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল। উত্তর-পূর্ব ভারতে আদিবাসীদের উন্নয়ন প্রশ্নে ড. এলুইন প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর Consultant for Tribal Affairs হিসাবে কাজ

করেছিলেন এবং Adviser for Tribal Affairs হয়েছিলেন। পরবর্তীতে আবার নেহেরু সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক নিযুক্ত কমিটির চেয়ারপার্সনও হয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত The Report of The Scheduled Areas and Scheduled Tribes Commission (1960-61) এর মুখ্য রূপকার ছিলেন ড. এলুইন। আদিবাসীদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভেরিয়ার এলুইন স্বতন্ত্রকরণের নীতিতে প্রত্যয়শীল ছিলেন। আর এজন্য আদিবাসীদের স্বাভাবিক চিরাচরিত জীবনযাত্রাকে অব্যাহত রেখে স্বাভাবিক অগ্রগতি আনার জন্য স্বতন্ত্র উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। সেই উপনিবেশে আদিবাসীরা তাদের সাবেকি জীবনধারাগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেই জীবন-যাপন করবে বলে মনে করেন। কারণ সেখানে আবগারি আইন, জঙ্গল আইন, ভূমি আইন বলে কিছু থাকবে না এবং বাইরের কোনো সংস্কৃতি প্রবেশাধিকার পাবে না। অন্য গোষ্ঠীর মানুষের সংস্পর্শ থেকে আদিবাসীদের যতটা দূরে রাখা যায় ততই মঙ্গল বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তাঁর এই চিন্তা ধারা 'ন্যাশনাল পার্ক থিওরি' নামে পরিচিত। ১৯৩৯ সালে ভারত সরকারের কাছে এই পার্ক বা আদিবাসী উপনিবেশ স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আদিবাসী জীবনধারার উপর যাতে বাইরের কোন আঘাত না আসে, তারা যাতে নিজস্ব অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনে নিজেদের জীবনকে উপলব্ধি করতে পারে তার জন্য তিনি ১৯৪৬ সালে স্বতন্ত্রকরণ নীতিকে সমর্থনও জানিয়ে ছিলেন।[৩]

বাস্তবিকভাবে সমগ্র বিশ্বজুড়ে জনজাতি সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার ধরণ সম্পর্কে অনেক মতবিরোধ আছে। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতীয় সমাজে জনজাতিদের কোন স্থান দেওয়া হবে তা নিয়ে প্রধান দুটি দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে। একটি দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, জনজাতিদের স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার দিতে হবে এবং তাদের নিজের এলাকার উপর আলাদাভাবে কর্তৃত্ব বা সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে হবে এবং সেখানে কোনো বহিরাগত তাদের জীবনযাত্রার ধারায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকবে না। অন্য দৃষ্টিভঙ্গিটি হল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভারতীয় সমাজের পারিপার্শ্বিকতায় জনজাতিদের পুরোপুরি অঙ্গীভূত করতে হবে। আর তা করতে গিয়ে যদি জনজাতীয় জীবনধারা বিলুপ্ত হয়ে যায় তবে দুঃখের কিছু নেই; বরং তাকে স্বাগত জানাতে হবে, কেননা সেটাও তাদের 'উন্নতির' লক্ষণ।[৪] ১৯৫২ সালের গণপরিষদে আদিবাসী বিষয়ক আলোচনায় এই বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কারণ এই বিষয়গুলির পর্যালোচনার মাধ্যমেই পরবর্তীতে আদিবাসী বিষয়ক নীতি নির্ধারণ করা হয়। ভেরিয়ার এলুইন প্রথম ধারায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'Integration was not possible without political and spiritual equality'.[৫] অন্যদিকে বিপরীত মতামত প্রকাশ করেন অমৃত লাল বিঠল দাস, যিনি বিশেষ ভাবে 'ঠক্কর বাপ্পা' (Thakkar Bappa) নামে পরিচিত ছিলেন। গোপালকৃষ্ণ গোখলের মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আদিবাসীদের জন্য কাজ করেন এবং তাদের ঐক্যবদ্ধভাবে জাতীয় স্তরের উন্নয়নে কাজে লাগানোর পন্থা অনুসরণ করেন। জনজাতিদের বনভূমি সম্পর্কিত সত্যাগ্রহ (কংগ্রেস সমর্থিত) তাঁর প্রচেষ্টার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। গান্ধী এলুইনকে 'ঠক্কর বাপ্পা'-এর সঙ্গে কাজ করার পরামর্শ দিলে তিনি তা গ্রহণ করেননি, বরং কংগ্রেস থেকে সবরকম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে গোণ্ড গ্রামে গিয়ে নিজের ইচ্ছায় সমাজসেবা শুরু করেন। তবে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু দুটি মতামতকেই খারিজ করেন এবং তিনি বলেন, প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী জনজাতীয় মানুষেরা যেন সংগ্রহশালায় সাজিয়ে রাখা নমুনা, যাকে পর্যবেক্ষণ করা যাবে, যাকে নিয়ে লেখালেখি করা যাবে। জনজাতিদের পক্ষে এটা অপমানসূচক, সুতরাং জনজাতীয় মানুষদের বহির্জগৎ থেকে আলাদা করে নিজেদের মতো থাকতে দেওয়া যায় না। আজকের দিনে তো এইভাবে আলাদা ভাবে সরিয়ে রাখা একেবারেই অসম্ভব, কেননা বহির্জগৎ ইতিমধ্যেই গভীরে তলিয়ে গেছে। কাজেই তাদের আলাদা করে সরিয়ে রাখা সম্ভবও নয়, কাম্যও নয়। আর দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, ভারতের মানুষের বিশাল মহাসমুদ্রে তাদের বিলীন করে দেওয়া, অর্থাৎ কিনা বহির্জগতের স্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অভিঘাতে তাদের সামিল করা। নেহেরুর মতে এটিও ভুল দৃষ্টিভঙ্গি। এর ফলে জনজাতিদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় নষ্ট হয়ে যাবে। আসলে তিনি মনে করতেন যে, স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগুলোকে যদি এখানে চলতে দেওয়া হয় তাহলে বহির্জগতের মানুষেরা এসে জনজাতীয় জল, জঙ্গল ও জমি অধিকার করে তাদের জীবনকে ব্যাহত করবে। এর ফলে তাদের সমগ্র জীবনধারা ও সংস্কৃতি, যার মধ্যে তাদের নিজস্ব যে স্বাতন্ত্রতা রয়েছে তা বিলীন হয়ে যাবে।[৬] সুতরাং আদিবাসী সমাজের

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 52
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 440 - 450
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধকে অক্ষত রেখেই তিনি তাদের সমাজকে আধুনিক ও সংহত করতে চেয়েছিলেন। তিনি মূলত বহুত্ববাদী ভারতীয় সমাজের সঙ্গে আদিবাসী গোষ্ঠী সত্ত্বার সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিলেন।

অন্যদিকে অনগ্রসর অবস্থা থেকে আদিবাসীদের তুলে আনার ক্ষেত্রে নেহেরু তাদের বিশেষ পদ্ধতিতে এবং তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুসারে গণতান্ত্রিকভাবে উন্নতি সুনিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। আদিবাসীদের কল্যাণ বিষয়ে শোষণবিহীন অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং নিরাপত্তার প্রশ্নে তিনি ছিলেন উদারমনস্ক।

> "But while Nehru was anxious to pull the tribal people up from their state of backwardness, he wanted to ensure that they should develop in 'their own special way' and 'democratically accordingly to their own culture and tradition'. Nehru was so deeply interested in the welfare of the tribal people that he did not wish in any way to impose upon them the same type of growth which may be adopted by the rest of India."[৭]

১৯৫২ সালে নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত 'Scheduled Tribes and Scheduled Areas' কনফারেন্সের প্রারম্ভিক অধিবেশনে 'The Tribal Folk' শীর্ষক বিষয়ে বক্তৃতায় আদিবাসীদের অত্যন্ত সুশৃঙ্খল মানুষ এবং ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় অনেক বেশি গণতান্ত্রিক বলে মত প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে ভারতীয় আদিবাসী বিষয়ক উপলব্ধি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দারিদ্র্য ও বঞ্চনার মধ্যেও তাদের মধ্যে রয়েছে প্রাণময়তা, রয়েছে মূল্যবোধ ও ব্যক্তিত্ববোধের স্বতন্ত্রধারা, যা ভারতীয় সভ্যতার নিষ্কলুষ ঐতিহ্য।[৮] তাই তিনি আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষার সংরক্ষণকে উৎসাহিত করা উচিত বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু গণপরিষদে জনজাতিদের একমাত্র প্রতিনিধি জয়পাল সিং মুন্ডা যখন বহু বছর ধরে চলা জনজাতিদের উপর অকথ্য অত্যাচার ও সামাজিক অবিচারের কাহিনিকে তুলে ধরেন তখন নেহেরু তাঁকে বলেন যে, তাদের ওপর বিচার, অধিকারবোধ ও সাম্য সমানভাবে বর্তমান যেভাবে গণপরিষদে অন্যান্য সদস্যদের ওপর বিচারব্যবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গি বিরাজ করে। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার ব্যাখ্যা একটি মাত্র শব্দে প্রকাশিত। যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় জনজাতিদের প্রতি কেমন বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি রাখা যায়, তখন তিনি মানবতার (Humanity) কথা বলেন।[৯] আবার অন্যদিকে বৃহত্তর ভারতীয় জনসমাজের সঙ্গে আদিবাসী সমাজ সংস্কৃতির একাত্মতায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন যে, 'আমি শঙ্কিত হই যখন আমি শুধু এই দেশেই নয়, অন্যান্য মহান দেশেও দেখি মানুষ কতটা উদ্বিগ্ন অন্যদেরকে তাদের নিজস্ব প্রতিমূর্তি বা উপমা অনুযায়ী গঠন করতে এবং তাদের ওপর নিজেদের বিশেষ জীবনযাপনের পদ্ধতি চাপিয়ে দিতে'।[১০] এমন মননশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আদিবাসী কল্যাণে পাঁচটি মৌলিক নীতি নির্ধারণ করেন ১৯৫৮ সালের ৯ই অক্টোবর, যা 'পঞ্চশীল' নামে পরিচিত। কিছুটা পরিমার্জিত করে হলেও নেহেরু শেষ পর্যন্ত এলুইনের মতাদর্শকেই গ্রহণ করেছিলেন। আদিবাসী ও তাদের উন্নয়ন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ধারণা তৈরি করতে নেহেরু যে এলুইনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তা তিনি নিজেই স্বীকার করে বলেন, -

> "My ideas were not clear at all, but I felt that we should avoid two extreme courses: one was to treat them as anthropological specimens for study and the other was to allow them to be engulfed by the masses of Indian humanity. These reactions were instinctive and not based on any knowledge or experience. Later, in considering various aspects of these problems and in discussing them with those who knew much more than I did, and more specially with Verrier Elwin, more definite ideas took shape in my mind."[১১]

পঞ্চশীলের ভাবনাগুলি পরবর্তীতে জনজাতিদের অবস্থান নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, তাই পঞ্চশীলের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন, যাতে ভারতের জনজাতিদের ওপর ভবিষ্যতের প্রভাবগুলিকে সহজেই বিশ্লেষণ করা যায়। নেহেরুর পঞ্চশীল পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত আদিবাসী উন্নয়নের পাঁচটি বিষয় হল[১২]–

১) জনজাতিরা তাদের নিজস্ব গুণ ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিকাশ লাভ করতে পারে সেই দিকে নজর দিতে হবে। উপর থেকে কোনো কিছু জোর করে তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। প্রত্যেকটি আদিবাসী গোষ্ঠীকে নিজেদের ভাবধারা ও ঐতিহ্য অনুসারে গড়ে উঠবার সুযোগ দিতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারকে সাধ্যমত উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

২) আদিবাসীদের জঙ্গল ও ভূমির ওপর অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে। বহিরাগত কোনো গোষ্ঠী জমির স্বত্ব নিতে পারবে না। জনজাতি এলাকায় বাজারি অর্থনীতির অনুপ্রবেশ দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মাধীন করতে হবে।

৩) জনজাতিদের উন্নতির ক্ষেত্রে তাদের মধ্য থেকেই যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচিত করে তাদের যথাযথ শিক্ষা দিয়ে উন্নয়নের কাজে নিযুক্ত করতে হবে। প্রথম অবস্থায় আদিবাসী এলাকায় বাইরে থেকে বিশেষজ্ঞ আনা হতে পারে। তবে স্থানীয় লোকেরা শিক্ষাপ্রাপ্ত হলে বাইরে থেকে বিশেষজ্ঞ আনার নীতি পরিত্যাগ করতে হবে।

৪) জনজাতিদের ওপর প্রশাসনিক জটিলতা সর্বতোভাবে পরিহার করতে হবে। আদিবাসী অঞ্চলের ওপর অতিরিক্ত শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ না করে তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে কাজ করতে হবে।

৫) উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কার্যকারিতা পরিসংখ্যান বা অর্থব্যয়ের পরিমাণ দ্বারা বিচার্য হবে না। আদিবাসীদের জীবনযাত্রার গুণগত উৎকর্ষ হয়েছে কিনা এবং হয়ে থাকলে তা কতটুকু এটাই হবে বিচার্য বিষয়।

বস্তুত নেহেরু পঞ্চশীল নীতির মাধ্যমে আদিবাসীদের সরাসরি আত্তীকরণ না করে তাদের সহজাত সৃজনী ক্ষমতা অনুসারে বেড়ে ওঠার পক্ষে মত দেন। আবার নেহেরুর এই দৃষ্টিভঙ্গির মূল বিদ্যমান ছিল বিশের দশকের পরবর্তী জনজাতি সংক্রান্ত জাতীয়তাবাদী নীতির মধ্যে; মূলত বিশের দশকে গান্ধীজি জনজাতি এলাকাগুলিতে আশ্রম গড়ে গঠনশীল কাজে উৎসাহ দিতেন। আবার স্বাধীনতার পরে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ ও অন্যান্য বড় বড় রাজনৈতিক নেতা এই নীতিকেই সমর্থন করেন। কিন্তু এই নীতির বাস্তবিক রূপায়ণের ক্ষেত্রে নানান ত্রুটি ধরা পড়ে। অর্থাৎ নীতির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মধ্যে একটা বিস্তর ফারাক থেকে যায়, যার অন্যতম কারণ হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক ত্রুটি। আদিবাসী অঞ্চলে নিযুক্ত আমলা বা প্রশাসকরা তাদের উন্নয়নের পরিবর্তে বুর্জোয়াদের স্বার্থ চরিতার্থ করেছিল। সেই সঙ্গে আদিবাসী অঞ্চলে সবথেকে বেশি সুবিধা লাভ করে ঠিকাদার, জমিদার ও মহাজনেরা। অন্যদিকে জনজাতিদের দুর্দশার একটি প্রধান কারণ হল সুবিচারের অভাব। অনেক সময়েই আইন আর আইনি ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত না থাকায় জনজাতীয় জমি বহিরাগতদের হাতে চলে যাওয়ার বিরুদ্ধে যে আইন আছে তা ক্রমাগত লঙ্ঘিত হয়েছে, ফলে জমি হস্তান্তর ও জনজাতিদের উচ্ছেদ চলেছে সমানে। সেই সঙ্গে বহু এলাকায় খনি আর শিল্পের দ্রুত প্রসার তাদের অবস্থাকে আরও সঙ্গিন করে তুলেছে। দুর্নীতগ্রস্ত কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতা আর বন-ঠিকাদারদের অশুভ চক্রের প্রকোপে ক্রমাগত জঙ্গল হাসিল হয়েছে। আর সেই অনুপাতেই বন ও বনজ সম্পদের ওপর জনজাতিদের চিরাচরিত অধিকার খর্ব হয়েছে। জমি হারানো, জঙ্গল হাসিল আর অরণ্যের অধিকারে বাধা-নিষেধের পরিণামে জনজাতিদের মধ্যে আর্থিক সংকট চরম রূপ ধারণ করে। অন্যদিকে জনজাতি সমাজে শ্রেণি বৈষম্য ও শ্রেণি কাঠামো গড়ে উঠেছে। সেই কাঠামোর উপরের স্তরের লোকেরা বহিরাগতদের সঙ্গে প্রায়ই হাত মেলায়। তাছাড়া শিক্ষা, প্রশাসনিক সুবিধা, অর্থনীতি আর রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে জনজাতিদের মধ্যে যেটুকু বিকাশ তার বেশিরভাগ সুবিধা ভোগ করে জনজাতি সমাজের এলিটদের ক্ষুদ্র অংশটি। ফলে সাধারণ নিম্নশ্রেণির আদিবাসীরা এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। আবার এই এলিটশ্রেণির হাত ঘুরেই নিম্নশ্রেণির আদিবাসীদের জমি বহিরাগতদের দখলীকৃত হয়। ভারতের মতো সামন্ততান্ত্রিক সমাজে এবং ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক ভিত্তির ওপর ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি ডেমোক্র্যাসি প্রতিষ্ঠা করা যে কত দুঃসাধ্য তা সহজেই অনুমেয়। ফলত, জওহরলাল নেহেরু পরিকল্পিত ‘সমাজতন্ত্র’ যে ভারতের মতো দেশে ‘সোস্যালিজম’ হয়ে ওঠেনি তা দৃঢ়ভাবে বলা যায়। কাজেই এই সব নীতির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভেরিয়ার এলুইনের করা দৃষ্টিভঙ্গি সময়ের সঙ্গে বেশি কার্যকর ও ফলপ্রসূ বলে দেখা দিল, কারণ এলুইনের করা দৃষ্টিভঙ্গি স্বাধীনোত্তরকালে জনজাতিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাঁর করা সেই দৃষ্টিভঙ্গি ১৯৪৩ সালে *The Aboriginals* গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা হয় যে, শুধু ভারতবর্ষ কেন সারা পৃথিবীজুড়ে যেভাবে প্রাচীনত্বের বদলে আধুনিক ছোঁয়া ও আধুনিক সভ্যতার কবল থেকে জনজাতিদের সহজাত অভ্যাস, আদব-কায়দা, সংস্কৃতি প্রভৃতির অক্ষুণ্ণতা বাঁচিয়ে রাখা দুষ্কর। কাজেই জনজাতিদের এই সব প্রাচীনত্বকে টিকিয়ে রাখার একমাত্র বিকল্প হল অবক্ষয়। কুড়ি, পঞ্চাশ অথবা শতবছরে কোনো এক মানবগোষ্ঠীর অভ্যুত্থান ঘটবে যারা যথেষ্ট শিক্ষিত হয়ে তাদের অর্থাৎ জনজাতিদের কোনো ক্ষতিসাধন না করে নিজেদের সঙ্গে একাত্ম করে নেবে, তবে এই ধরনের মানুষ বা জনগোষ্ঠী বর্তমানে অমিল। তাই জনজাতিরা আপাতত নিজেদের বিচ্ছিন্ন রেখে নিজস্ব নিয়ম-নীতি ও

*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 52
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 440 - 450
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দৃষ্টিভঙ্গিতে সংস্কার আনুক। সেই সঙ্গে তিনি এটাও দাবি করেন জনজাতিদের না বদলে বদলাতে হবে উকিল, ডাক্তার, স্কুলশিক্ষক, প্রশাসক, ব্যাবসায়ীদের। যাদের সঙ্গে জনজাতিদের লেনদেন করতে হবে, মেলামেশা করতে হবে। তাই জনজাতিদের স্বতন্ত্র রাখাটাই শ্রেয়। যদিও পরবর্তীকালে এলুইন ও নেহেরু এই ধরনের নীতি থেকে সরে এসে সমন্বয়করণ নীতিকেই আদিবাসীদের উন্নয়নের সরকারি নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।[১৩] তবে এলুইনের করা এই মতাদর্শকে ঘিরে কলকাতা ভিত্তিক বিভিন্ন নৃতত্ত্ববিদ যেমন নির্মল কুমার বসু, ধীরেন্দ্র কুমার মজুমদার প্রমুখের মধ্যে তীব্র মতানৈক্য গড়ে ওঠে। নির্মল কুমার বসু আলোচ্য মতাদর্শকে 'Curio-hunting' এবং 'Unbalanced Romantic concern for Tribals' বলে উল্লেখ করেন।[১৪] যদিও এলুইনকে 'রোম্যান্টিক' বলে আখ্যা দেওয়া হয় তবুও তাঁর করা পর্যবেক্ষণের মধ্যে অবশ্যই কিছু সত্যতা ছিল। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরবর্তীকালেও ব্রিটিশ পরম্পরা ও আভিজাত্যকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করা হয়। ব্রিটিশরাজের তিনটি স্তম্ভ যথা— বুর্জোয়া, সেনাবাহিনী ও পুলিশ তিনটিকেই যথারীতি বজায় রাখা হয়। তাছাড়া বিভিন্ন বৈদেশিক সংস্থার পরিচর্যা ও তার সঙ্গে গান্ধীবাদী আদর্শের সংরক্ষণের অনীহা স্বদেশীয় সংস্কৃতি ও সামাজিক ভাবধারাকে বিভিন্ন ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল।[১৫] কারণ স্থানীয় ও আঞ্চলিক নিয়মাবলীতে বৈদেশিক চিন্তাধারা ও আগ্রাসী মনোভাবের আনুগত্য বজায় রাখা হয়। তবে সংবিধান রচনার প্রাক্কালে একমাত্র কংগ্রেস নেতা ও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী (১৯৫৪-১৯৬০) সম্পূর্ণানন্দ (Sampurnanand) এই মতাদর্শের সমালোচনা করে বলেন, -

> "Our constitution is a miserable failure. The spirit of Indian Culture has not breathed in it … It is just a piece of legislation, like say, the Motor Vehicle Act."[১৬]

অন্যদিকে স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের নীতি নির্ধারকগণ দলিত ও আদিবাসীদের একসূত্রে বেঁধে নানান পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। কিন্তু এটাও বলা প্রয়োজন যে আদিবাসী ও দলিতরা কখনই এক নয়, অনেকাংশে আলাদা। ভারতের সংসদীয় রাজনীতিতে প্রতিনিধিত্বের দরুন দলিতরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে নিজেদের কিছুটা প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেও আদিবাসীরা সেই দিক থেকে বঞ্চিত হয়, কারণ ভারতীয় মূলস্রোত রাজনীতির পুরোটাই উচ্চবর্গের দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে ১৯৫১-৬৪ সাল পর্যন্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বা আদিবাসীদের সংখ্যা খুবই কম থাকায় এবং সমাজের উচ্চশ্রেণির মানুষেরাই প্রধান নিয়ন্ত্রক হওয়ায় তাদের নিজস্ব চিন্তা ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। কিন্তু জনজাতিদের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন ছিল জোরালো। উড়িষ্যার গণপরিষদের সদস্য যুধিষ্ঠির মিশ্র (Yudhisthir Mishra) জনজাতিদের কাছ থেকে এক স্বারকলিপি পান, যার ভিত্তিতে গণপরিষদে প্রশ্ন উত্থাপন পর্বে তিনি তার উল্লেখ করে বলেন, জনজাতিরা বিশ্বাস করে না গণপরিষদ তাদের প্রতিনিধিত্ব করে এবং তাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব নেয়।[১৭] পরবর্তীতে প্রথমা ব্যানার্জী তাঁর 'Writing the Adivasi : Some historiographical notes' প্রবন্ধে একই মতামত পোষণ করে বলেন যে, -

> "আমাদের সংবিধান তপশিলি জাতি এবং তপশিলি জনজাতিকে একই রকম ভাবে চিহ্নিত করেছে, অন্ততপক্ষে জাতীয় রাষ্ট্র হিসাবে তার দায়িত্বের দিক থেকে। উদাহরণ স্বরূপ বহুজন সমাজ দল রাজনৈতিক ভাষ্যে দলিত এবং আদিবাসীদের একই বন্ধনীভুক্ত করেছে। অনুরূপভাবে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সোস্যাল সায়েন্স তাদের বর্তমান পর্যালোচনায় 'দলিত ও আদিবাসী' শীর্ষক আলোচনায় একই অধ্যায় ব্যয় করেছে। কিন্তু বস্তুতপক্ষে দলিত ও আদিবাসীদের তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যাবে যে, গণতন্ত্রের চরিত্র সম্পর্কে ধারণায় এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য বিদ্যমান। সহজভাবে বলতে গেলে দলিতরা যেখানে প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের পক্ষপাতি, আদিবাসীরা সেখানে স্বায়ত্তশাসনের দাবিদার।"[১৮]

যা আমাদের ১৯৫২ সালে গণপরিষদে করা জয়পাল সিং মুন্ডার মন্তব্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি সেখানে বলেন, -

> "You can't teach democracy to Tribals. You need to learn democratic values from them…we do not have any right to impose our beliefs and beliefs on them."[১৯]

স্বাধীনতা উত্তরকালে আদিবাসীদের সমস্যা সমাধানকল্পে ব্যবহারিক প্রক্রিয়া সমূহ যেমন, সম্পত্তি আইন কার্যকর করা, কৃষি উন্নয়ন, অরণ্য সংরক্ষণ আইনের পরিবর্তন, চিকিৎসার সুযোগ, আদিবাসী অঞ্চলে শিল্পায়ন, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়গুলির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ভারত সরকার সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আদিবাসীসহ দেশের জনগণের সার্বিক উন্নয়নে ১৯৫০ সালের মার্চে গঠিত হয় 'ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিশন'। দেশে জনসাধারণের স্বার্থে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও রূপায়ণই ছিল যার একমাত্র উদ্দেশ্য। এই কমিশন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও তাদের জীবন অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করে তোলার দিকে সচেষ্ট হয়। কমিশন সফলতা অর্জনের প্রতি আস্থা রেখেই ১৯৫১ সালে জুলাই মাসে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৫১-৫৬) খসড়া পেশ করে। সমগ্র দেশের সার্বিক উন্নয়নের কথা ভেবে এই পরিকল্পনার বিষয়গুলি নির্ধারণ করা হয়। তবে আদিবাসীদের ক্ষেত্রে পঞ্চশীলের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাস্তবায়নের কথা বলা হয়। আমাদের গবেষণার সময়পর্বে (১৮৫৫-১৯৬৪) তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিষয়গুলি আলোচনার মূল বিষয়। সমগ্র ভারতে আদিবাসীদের ক্ষেত্রে এই তিনটি পরিকল্পনার প্রভাব আলোচনার পূর্বে পরিকল্পনায় ঘোষিত সার্বিক বিষয়গুলি সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন; কারণ তবেই ভারতের মূলস্রোত জনসমাজের সঙ্গে আদিবাসীদের মধ্যে এই পরিকল্পনাগুলির প্রভাব সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করা সম্ভব হবে। তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিষয়গুলি নিম্নরূপ—

**১) প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫১ খ্রীঃ – ১৯৫৬ খ্রীঃ) :** স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষ যে বহুমুখী অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল তা দূর করার উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ রয় হ্যারল্ড ও ইভিসি ডোমারের রচিত মডেলকে অনুসরণ করে এই পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করা হয়। যেখানে বিনিয়োগে অগ্রাধিকার পায় কৃষি ও কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্পে শতকরা ১৫ ভাগ, বৃহৎ ও মধ্য সেচ পরিকল্পনায় শতকরা ১৬ ভাগ এবং শক্তি প্রকল্পে শতকরা ১৩ ভাগ বিনিয়োগ করা হয়। যানবাহন ও সমাজসেবামূলক প্রকল্পে বিনিয়োগ যথাক্রমে শতকরা ২৭ ও ২৩ ভাগ। শিল্প ও খনি উন্নয়নে শতকরা ৪ ভাগ এবং আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য মাত্রা স্থির করা হয় শতকরা ১২ ভাগ, কিন্তু তা বেড়ে দাঁড়ায় শতকরা ১৮ ভাগে। কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল প্রায় ১৭ ভাগ। অন্যদিকে পাবলিক সেক্টরে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বরাদ্দ করা হয় ২৩৫৬ কোটি টাকা। তবে এক্ষেত্রে বেকারের সংখ্যা হ্রাস করা যায়নি, বরং তা বৃদ্ধি পায়। পরিকল্পনার প্রারম্ভে বেকারের সংখ্যা ছিল ৫০ লক্ষ ও নতুন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৯০ লক্ষ। কিন্তু পরিকল্পনায় মাত্র ৪৫ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। ফলত দেশের সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষা-স্বাস্থ্য এবং নিম্নবর্গ ও আদিবাসীদের দারিদ্র দূরীকরণের বিষয়গুলির সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হয়নি।[২০]

**২) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫৬ খ্রীঃ - ১৯৬১ খ্রীঃ) :** প্রথম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য অব্যাহত রেখেই দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য মাত্রা স্থির করা হয়। অধ্যাপক পি.সি. মহলানবীশ মডেল অনুসরণে এই পরিকল্পনা রচিত হয়। তবে এই পরিকল্পনায় প্রথম পরিকল্পনার বিপরীত চিত্র লক্ষ করা যায়। প্রথম পরিকল্পনায় 'কৃষি ও সেচ' প্রাধান্য লাভ করলেও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গুরুত্ব দেওয়া হয় 'শিল্প ও পরিবহন' বিষয়কে। এই পরিকল্পনায় শিল্পখনিতে বিনিয়োগের পরিমাণ ধার্য করা হয় মোট বিনিয়োগের ২০ শতাংশ। পরিবহন-সংযোগ ও সমাজসেবা প্রকল্পের জন্য ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ যথাক্রমে ২৮ শতাংশ ও ১৮ শতাংশ। অন্যদিকে পাবলিক সেক্টরে ব্যয়ের পরিমাণ ৪৬০০ কোটি টাকা, তবে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৪৮০০ কোটি টাকা। অন্যদিকে প্রাইভেট সেক্টরে ব্যয়ের পরিমাণ ২১৫০ কোটি টাকা আর বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ২৪০০ কোটি টাকা। এই পরিকল্পনায় লৌহ আকরিক ও এ্যালুমিনিয়মের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ স্থির করা হয় ৫০ শতাংশ, ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ ১০০ শতাংশ, ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ ও শক্তি সরবরাহের ক্ষেত্রে ৬৮ শতাংশ। দুর্গাপুর, ভিলাই ও রৌরকেল্লায় একটি করে নতুন ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়। কৃষির ক্ষেত্রে ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটে আর জাতীয় ক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য ৫ শতাংশ স্থির করা হলেও তা ৪ শতাংশে দাঁড়ায়। কিন্তু এই পরিকল্পনার সমাপ্তি লগ্নে বেকারের সংখ্যা

দাঁড়ায় ৯০ লক্ষ এবং দ্রব্য মূল্য ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ফলে সমাজে সাধারণ-নিম্নবর্গ ও আদিবাসী মানুষের অর্থনৈতিক সংকট অধিকতর ঘনীভূত হয়।[২১]

**৩) তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৬১ খ্রীঃ-১৯৬৬ খ্রীঃ) :** এই পরিকল্পনায় কৃষি ও শিল্পের মধ্যে যাতে ভারসাম্য বজায় থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখা হয়। সেই সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে ভারী শিল্পের প্রসার সাধনে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এই পরিকল্পনার সম্পদ বন্টনের চিত্রটি নিম্নরূপ[২২]—

ক) কৃষি, সেচ ও শক্তি প্রকল্পে ৩৬ শতাংশ।
খ) গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পে ৪ শতাংশ।
গ) খনি ও বৃহৎ শিল্পে ২০ শতাংশ।
ঘ) পরিবহন ও সংযোগ প্রকল্পে ২০ শতাংশ।

সেই সঙ্গে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ধরা হয়েছিল বার্ষিক ৫ শতাংশ, কিন্তু সে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি। বৃদ্ধির হার ৩.৪ শতাংশে দাঁড়ায়। খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল ১০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন, কিন্তু ১৯৬৪-৬৫ এবং ১৯৬৫-৬৬ তে খাদ্যশস্য উৎপাদন যথাক্রমে ৮৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন ও ৭২.৩ মিলিয়ন মেট্রিক টনে এসে দাঁড়ায়। তবে এই প্রকল্পের ব্যর্থতাও পরিলক্ষিত হয়, বিশেষ করে শিল্পের ক্ষেত্রে। ইস্পাত শিল্পের উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা ছিল ৯.২ মেট্রিক টন, কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৬.৫ মেট্রিক টনে। সেই সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহত থাকে।[২৩]

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আদিবাসী এলাকায় কমিউনিটি উন্নয়ন, কৃষি ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় ভারী শিল্প নির্মাণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। আর এই ভারী শিল্প ও কলকারখানা স্থাপনে অধিকৃত হয় এক বৃহৎ পরিমাণ আদিবাসী জমি। ফলত, বহু সংখ্যক আদিবাসী পরিবারকে বাস্তুচ্যুত হতে হয়। অন্যদিকে এই বৃহৎ কলকারখানা পরিচালনায় আদিবাসীদের দক্ষতা না থাকায় তারা নিজেদেরকে বিশেষভাবে যুক্ত করতে পারেনি। ফলত, আদিবাসী এলাকায় খনিজ সম্পদ ও ভারী শিল্প থাকা সত্ত্বেও তাদের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব পড়েনি বরং তার উল্টোটাই ঘটে। শুধু তাই নয়, এই শিল্পের কাজে এক বৃহৎ সংখ্যক বহিরাগত দিকুদের প্রবেশ ঘটে আদিবাসী এলাকায়। যার দরুন আদিবাসী সমাজ-সংস্কৃতি, জনবিন্যাস ও অর্থনৈতিক কাঠামো গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। তাদের এলাকায় খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও শিল্প স্থাপনের দরুন রাষ্ট্র যে পরিমাণ অর্থ লাভ করে তার সামান্য পরিমাণই আদিবাসীদের মান উন্নয়নে বরাদ্দ করা হয়। যার পরিসংখ্যান নিম্নরূপ[২৪]—

| পরিকল্পনার সময় | মোট বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ | আদিবাসীদের উন্নয়ণকল্পে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ | শতাংশের হিসাবে |
|---|---|---|---|
| প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫১-৫৬) | ২০৬৯.০০ | ১৩.৯৩ | ০.০৬ |
| দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫৬-৬১) | ৪৮০০.০০ | ৪৯.৯২ | ১.০৮ |
| তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৬১-৬৬) | ৭৫০০.০০ | ৫০.৫৩ | ০.৬০ |

আবার এই নব উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে সঠিকভাবে রূপায়ণ ও আদিবাসীদের স্বার্থ রক্ষার্থে সংবিধানে নানান রক্ষা কবচের ব্যবস্থা করা হয়। আর এর জন্য প্রথমেই ভারতীয় সংবিধানে জনজাতিদের সিডিউল্ড ট্রাইব বা তপশিলি জনজাতি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে, ট্রাইবাল সাব প্ল্যান (TSP) গঠন করা হয়। যদিও আদিবাসী মহাসভার সভাপতি জয়পাল সিং মুন্ডা সংবিধানে আদিবাসী শব্দটি রাখার প্রস্তাব করেছিলেন। কারণ জনজাতিরা নিজেদের আদিবাসী বলতেই বেশি পছন্দ করে, সেই সঙ্গে আদিবাসীদের বৈশিষ্ট্যগুলিকে সঠিকভাবে চিহ্নিতকরণের জন্য সংবিধানের ৩৩৬(২৫) নং ধারায় উল্লেখ করা হয়, তপশিলি

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 52*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 440 - 450*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

জাতি হল সেই গোষ্ঠী যা রাষ্ট্রপতি ৩৪২(১) নং ধারা বলে পাবলিক নোটিফিকেশন দিয়ে নির্দিষ্ট করেন। যেখানে আদিবাসীদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করা হয় যথা, ১) একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক অঞ্চলে বসবাসকারী, নির্দিষ্ট প্রথা অনুসারে জীবন-যাপনকারী গোষ্ঠী, ২) সুনির্দিষ্ট সংস্কৃতিসম্পন্ন গোষ্ঠী, ৩) পৃথক ভাষা, প্রথা, ধর্মীয় বিশ্বাস, শিল্প, সংগীত সম্পন্ন গোষ্ঠী, ৪) শিক্ষা ও প্রযুক্তির অভাব।[২৫] আর এই বৈশিষ্ট্যগুলির নিরিখে আদিবাসীদের পর্যায়ভুক্তকরণের পাশাপাশি বৈশিষ্ট্যগুলির রক্ষার্থে সংবিধানে নানান আইনি ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করা হয়। সরকারি নীতির বাস্তব রূপ দেওয়ার প্রথম ধাপটি খোদ সংবিধানেই লিপিবদ্ধ করা হয়। ৪৬ নং ধারায় আদিবাসীদের সবরকম অন্যায় ও শোষণ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে জনজাতীয় রাজ্যগুলির রাজ্যপালের হাতে জনজাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়, বিশেষ করে জনজাতি এলাকায় কেন্দ্র-রাজ্য আইনের প্রযোজ্যতা প্রয়োজন অনুসারে বদলে নেওয়া, জমিতে জনজাতীয় অধিকার রক্ষা করা এবং মহাজনদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য নিয়মনীতি প্রণয়ন করার ক্ষমতাও দেওয়া হয়। আবার সংবিধান জনজাতীয় জনগণকে পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকারও প্রদান করে। এর জন্য ৩৩৪নং ধারা অনুযায়ী লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভায় নির্দিষ্ট আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। শুধু তাই নয়, জনজাতীয় জনবসতি যুক্ত প্রত্যেক রাজ্যে জনজাতি মঙ্গল সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি করে 'জনজাতি উপদেষ্টা পর্ষদ' গঠন করার ব্যবস্থা করা হয়। আবার ৩৩৫ নং ধারায় সরকারি চাকরিতে অগ্রাধিকার দান ও নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। ১৬৪ নং ধারানুযায়ী বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার জনজাতিদের জন্য স্বতন্ত্র মন্ত্রকের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও ২৭৫নং ধারানুযায়ী জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগমের মাধ্যমে আদিবাসীদের ৮০,০০০-১,০০,০০০ টাকা ঋণ ও অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। অন্যদিকে ২৭৫(১) নং ধারায় আদিবাসী এলাকায় চিকিৎসা ব্যবস্থা, সমবায় সমিতির জন্য আর্থিক সাহায্য, আদিবাসী মহিলাদের স্বনির্ভর করার প্রকল্প, আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করার কথা বলা হয়। সেই সঙ্গে আদিবাসী সংস্কৃতি, ভাষা, সংগঠন রক্ষার্থে নানা ব্যবস্থা সন্নিবেশিত হয়েছে। সংবিধান প্রদত্ত উপরোক্ত সব সুযোগ-সুবিধাগুলি আদিবাসীদের স্বার্থে যথাযত ভাবে কার্যকরী হচ্ছে কি না, তা দেখভাল করার জন্য ৩৩৪নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি একজন কমিশনার নিয়োগ করেন, যার কাজ হল সংবিধানে আদিবাসীদের জন্য যে সমস্ত রক্ষা কবচের ব্যবস্থা আছে সেগুলি সঠিকভাবে প্রয়োগ হচ্ছে কিনা, তা অনুসন্ধান করা।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আদিবাসীদের সমাজ-সংস্কৃতি, কৃষ্টি রক্ষার্থে সংবিধানে নানান ব্যবস্থা করা হলেও বাস্তবিক ক্ষেত্রে এই সব নীতির প্রয়োগের দিক দিয়ে একদিকে যেমন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বৈরিতা লক্ষ করা যায়, তেমনি অন্যদিকে নিরক্ষর সাধারণ আদিবাসী সমাজ এই সব আইনি ব্যবস্থা সম্পর্কে অপরিচিত হওয়ায় বা পরিচিত থাকলেও সেই সমস্ত আইনগুলিকে উকিল-আদালতের মাধ্যমে কার্যকরি করার সামর্থ না থাকায় তার সামান্যই সুফল লাভ করে। তাছাড়া সাংবিধানিক বিধানে এমন কিছু বিধান আছে যা আদিবাসীদের বৃহত্তর সমাজে সমন্বয়করণকেই সমর্থন করে। ফলে আদিবাসীদের ঐতিহ্যপূর্ণ সমাজ কাঠামো সাংবিধানিক রীতিনীতিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক ভাবে দেখতে গেলে নিম্নবর্গের চর্চা যেমন উচ্চবর্গের মস্তিষ্ক প্রসূত তেমনি সাংবিধানিক রীতিনীতি গঠনে আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা কম থাকায় (১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনের দ্বারা সংবিধান সভায় যারা নির্বাচিত হয়েছিলেন তারাই ভারতের সংবিধান রচয়িতা। এরা ছিলেন দেশীয় রাজা, সামন্ত প্রভু এবং মুৎসদ্দি-বুর্জোয়া অথবা তাদের প্রতিনিধি। পূর্বভারতের আদিবাসীদের প্রতিনিধি হিসাবে একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন জয়পাল সিং মুন্ডা, যদিও তিনি এলিট ঘরনার।) আদিবাসীদের মূল সমস্যাগুলি বিশেষভাবে মান্যতা পায়নি। আবার সংবিধান পরিচালনার দায়িত্বে থাকে উচ্চবর্গের দিকুরা; ফলে সাংবিধানিক রীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে পদাধিকারীরা সেই ফাঁক-ফোঁকরগুলির সুযোগ গ্রহণ করে। অন্যদিকে সাংবিধানিক রীতিনীতির গঠন ও সংশোধনের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা মাপকাঠি হওয়ায় এলিট সরকার অনেক সময় নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে আদিবাসীদের স্বার্থের কথা না ভেবেই সাংবিধান সংশোধন করেছে।

আদিবাসী গ্রামীণ সংগঠন মূলত জল, জঙ্গল, জমি (Subsistence Economy) নির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। ফলত, সেখানে হঠাৎ করে পুঁজিভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো ও শিল্পায়ন তাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত অর্থনৈতিক কাঠামোর বুনিয়াদকে ভেঙে ফেলে। আবার তাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে সমাজ-সংস্কৃতি গভীরভাবে

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 52
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 440 - 450
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সম্পৃক্ত থাকায় অর্থনৈতিক কাঠামোর ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্র সমাজ-সংস্কৃতি গভীর সংকটের মুখে এসে দাঁড়ায়। সুতরাং পুঁজিভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সার্বিক ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটালেও আদিবাসীদের ক্ষেত্রে তার বিপরীত চিত্র লক্ষ করা যায়। কাজেই সার্বিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন (Development) বলতে উন্নতির মাপ কাঠি বোঝালেও জনজাতিদের ক্ষেত্রে উন্নয়ন বা Development এর অর্থ, চার D = Displacement, Dispossession, Destitution, Dehumanization অর্থাৎ উন্নয়ন মানে বাস্তুচ্যুতি, জমি হরণ, নিঃস্ব হয়ে ভ্রাম্যমান মজুর, আত্মপরিচয় হারানো।[২৭] সুতরাং শোষণ মূলক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা আদিবাসী সমাজ জীবনে যে পরিবর্তন এনেছে, তার ফলে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে আদিবাসী জীবন, বিপর্যস্ত হয়েছে আত্মমর্যাদাবোধ, মূল্যহানী হয়েছে আত্মপরিচয়ের। সেই সঙ্গে তাদের চেতনায় যে পরিবর্তন ঘটেছে তাতে প্রতিবাদ করা তো দুরস্ত বরং নির্বাক হয়ে পড়েছে। পশুপতি প্রসাদ মাহাতো যাকে 'Culture of Silence' বলে উল্লেখ করেছেন।[২৮] কাজেই স্বাধীনতা পরবর্তী উন্নয়ন আদিবাসীদের শুধু অর্থনৈতিক কাঠামোই নয়, সমাজ-সংস্কৃতির পাশাপাশি তাদের চিন্তা চেতনাকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

**Reference:**

১. Census of India Report, 1931

২. Elwin, Verrier., The Aboriginals, Oxford University Press, London, First Published 1943, p. 19

৩. মণ্ডল, অমলকুমার, ভারতীয় আদিবাসী : সমাজ-সংস্কৃতি-সমস্যা-সংগ্রাম-সংকল্প, দেশ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৭, পৃ.
২৯৪

৪. Natarajan, Meenakshi, 'Tribal Haritage and People's Rights', in Abhay Flavian Xaxa and G.N Devy (eds.), Being Adivasi : Existence, Entitlement, Exclusion, Penguin Random House, New Delhi, 2021, p. 37

৫. Elwin, Verrier., A Philosophy for NEFA, Oxford, Delhi, 1959, Second Edition, 2008, p. 126

৬. Chandra, Bipan, Mridula Mukherjee, Aditya Mukherjee, India After Independence 1947-2000, Penguin Books India, Delhi, 1999, (অনুবাদ), আশীষ লাহিড়ী, ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭-২০০০, আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০০৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১১, পৃ. ১২৯

৭. Tripathi, C. D., And B. Dutta-Ray, Jawaharlal Nehru and the Disadvantaged, Department of Parliamentary Affairs, Government of Megalaya and North East India council for Social Science Research, 1992, p. 73

৮. The Scheduled Tribes and The Scheduled Areas Conference, Held in Delhi on the 7th, 8th, 9th June, 1952, p. 16

৯. Constituent Assembly Debates, Constituent Assembly of India, Vol-Viii, 4th November, 1949

১০. The Scheduled Tribes and The Scheduled Areas Conference, Held in Delhi on the 7th, 8th, 9th June, 1952, p. 16

১১. Tripathi, C. D., And B. Dutta-Ray, Jawaharlal Nehru and the Disadvantaged, Department of Parliamentary Affairs, Government of Megalaya and North East India council for social Science Research, 1992, pp. 62-63

১২. Jawaharlal Nehru's Endorsement of Verrier Elwin's Concept of Panchasil, in Relation to Tribals of India, in his Forward to A Philosophy of NEFA, Oxford, Delhi,1959, Second Revised Edition 2008, p. 56

১৩. Quoted from Ramachandra Guha, Savaging the Civilized : Verrier Elwin, His Tribals, and India, Penguin Random House India, Delhi, First Published 1999, Second Edition 2014, p. 250

১৪. Ibid., p. 273

১৫. Hugh Tinker, 'South Asia at Independence : India, Pakistan and Sri Lanka', in A. Jayarantam and Dennis Dalton (eds.), The States of South Asia : Problems of National Integration, Vikash Publishing House, New Delhi, 1982, p. 14

১৬. Ibid., p. 10

১৭. Constitution Assembly Debates, 19th December, 1946

১৮. Banerjee, Prathama, 'Writing the Adivasi : Some Historiographical notes', The Indian Economic and Social History Review, 53(1), 2016, pp.135-136

১৯. Constituent Assembly debates, Constituent Assembly of India : Vol – VII, Part – IX (4 November, 1948)

২০. The First Five Year Plan : A Draft Outline, Government of India, July-1951, (See Also), https://en.m.wikipedia.org/wiki/Five-Year_Plans_of_India. Date – 05/02/2023, Time – 1.30 P.M.

২১. The Second Five Year Plan : A Draft Outline, Government of India, February-1956, (See Also), https://en.m.wikipedia.org/wiki/Five-Year_Plans_of_India. Date – 10/02/2023, Time – 12.30 P. M.

২২. The Third Five Year Plan : A Draft Outline, Government of India, April-1961, (See Also), https://en.m.wikipedia.org/wiki/Five-Year_Plans_of_India. Date – 11/02/2023, Time – 10.30 A.M.

২৩. Ibid

২৪. Document of Planning Commission from 1st to 3rd Plan, Government of India

২৫. উদ্ধৃত : সেন, শুচিব্রত, ভারতের আদিবাসী : সমাজ, পরিবেশ ও সংগ্রাম, বুকপোস্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ১৬৩

২৬. Basu, Durga Das, Indroduction to the Constitution of India, Lexis Nexis, Nagpur, First Published 1960, Reprint 2012, p.430. (See Also), Chakraborty, shambhu prasad, Tribal Right in India, Partridge, Singapore, 2018, p. 153

২৭. মাহাতো, পশুপতি প্রসাদ ও সজল বসু, ঝাড়খণ্ড : সমাজ ও বিদ্রোহ-আন্দোলন, বুকপোস্ট পাবলিকেশন, কলকাতা,

২০২০, পৃ. ১০৪

২৮. Mahato, Pashupati Prasad, Sanskritization vs Nirbakization : A Study of cultural resistance of the people of Junglemahal, Purbalok Publication, Kolkata, First Published 2000, Second Edition 2012, p. 18